অনুরাধা মহাপাত্র

.....

অজ্ঞাতবাসের পথে

স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের মধ্যবর্তী একটা স্মৃতির জগৎ থাকে। যা স্বাভাবিক স্মৃতির সঙ্গে যোগ রেখেও একটা প্রান্তিক অজ্ঞাতসূত্র ধরে রাখে। হাঁটা-চলা, দেখা-শোনা, রাগ-বিরহ, ক্ষুধা, অনীহার ভিতর রঙের চিহ্ন ধরে স্মৃতিকে ডেকে আনা। স্মৃতি মানেই বিষাদভারাতুর অবস্থানকে জাগ্রত করা নয়। অনেকটা বন্ধ শিরায় হঠাৎ রক্ত চলাচলের উষ্ণতা কেমন এক অধীরতা প্রাপ্ত হয়। তারপর যোগসূত্র থাকে না, আবার অন্ধকারে ফিরে যায়। কিন্তু সে অন্ধকার শূন্য, ভিন্নতর কোনো দৃশ্যের জগৎ সূচিত করে। আসলে কথা নয়, ছবির পর ছবি। আবার ছবি হারিয়ে যায়। এর ভেতরে স্বথাতসলিলে কথা, কল্পনা জন্ম নেয়। অনেকটা খেলা কিংবা ঘুমিয়ে পড়ার মতো অবস্থা।

মাঝে মাঝে ছেলেটি দৌড়ে যায় ঘরের বাইরে। উধাও হয়ে যায়। আবার ফিরে আসে। মুখে অদ্ভুত শব্দ, আর ভ্রূর নীচে অসন্তোষ। এরপর সে তার একলা ঘরে চলে যায়। লোকজন ভালো লাগে না। ওর মা ওর মনের অবস্থান ধরতে পারে না—ছেলে কী চায়? মা দুপুরে ঘুমোয় ওকে একা রেখে। ছেলেটি পিঠ দিয়ে দরজা ঠেলে চলে অনর্থক, আবার চলে যায় জানলার পাশে। জানলার শিক ধরে বাইরে তাকায়—গাড়ি যায়, গাড়ির ছায়া হেলে পড়ে। এখানে পুকুর নেই। শুধুই গাড়ির মুখ—আবার ছেলেটির মুখে সেই শব্দ। যেন ডিজেলের অন্ধকার থেকে কোনো অপরিচিত ধ্বনি উঠে আসছে। ছেলেটির নাম গুড্ডু পালচৌধুরী। হঠাৎ সে মাটিতে শুয়ে পড়ে নিজের মুখে মারতে থাকে—ব্যাঃ ব্যাঃ শব্দ করে। আবার স্মৃতির হানা, আবার কাকে যেন ডেকে আনা। গুড্ডুর মা দার্জিলিংয়ের মেয়ে। বটানি নিয়ে পড়াশুনো করেছে। হাই পাওয়ারের চশমা। ছেলের কথা এমন করে ভাবেনি। স্বামী চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ঈশ্বর বিশ্বাসী। দেওঘরে অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য। আলাপ হওয়ার পর তাঁকে জিগ্যেস করি, 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে বলে মানেন?'

'মাঝে মাঝে মানি', বলে আবার গুড্ডুর দিকে তাকায়। গুড্ডু সমানে মুখে আঙুলের আঘাত করে চলেছে। সেই বিচিত্র শব্দ—আবার গাড়ি দেখা দিল নাকি!

আমি প্রশ্ন করি, 'পুজো করেন?'

'না, চুপ করে বসে ভাবি।'

'ছেলের জন্য কিছু চান'?'

'হ্যাঁ……না……অরবিন্দ আশ্রমের কথা মনে পড়ে। এতে মন শান্ত হয়ে যায়।' গুড্ডুর বাবা কথা শেষ করে প্রায় গুড্ডুর মতো হাসেন—চকিতে তীক্ষ্ণ কিছু একটা ফালা ফালা করে দেয়। তাহলে চার্টার্ড অফিস, বিশাল ফ্ল্যাট, নিশ্চয়তা—এসবই গাড়ির মুখের মতো অনিশ্চয়। 'কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই'—এতদিনে এই গানের একটা সূঁচবিদ্ধ ফাঁক দেখা গেল!

রূপকথার রাজ্য অস্ফুট পাথরচাপা অংকুরের মতো ছেলেমেয়েদের মাথার অন্ধকারে থেকে যায়। শরীর বাড়ে অথবা কমে, কিন্তু মনোজগৎ একেবারে শৈশব আর মাঝে যুবা-প্রৌঢ়ের মাঝামাঝি অংশটাকে ছুঁয়ে থাকে। শিশুর ভিতর তাড়া করে ফেরে যৌবন যাবার মুখের সেই বিশ্বরূপ—যা তীব্র, বিশাল, অসহায়। চাপাস্নিগ্ধ একটা স্মৃতিনাটক চলতে থাকে। অপরিণত মনোবুদ্ধির অস্বাভাবিকতা আসলে স্মৃতিকথনের গোপন পৃথিবী—যা রুদ্ধ উষ্ণ রক্তচাপের মতো। রূপকথা এখানে হঠাৎ হঠাৎ অন্ধকারে চলে যাওয়া ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিদৃশ্য-কথা, যার যোগ এই পৃথিবীরই কোথাও থেকে গেছে। ঐসব স্বাভাবিক মানুষের ভেতর আছে। অনেক সৃজনপ্রক্রিয়াই সারাজীবন তাড়া খেয়ে মরেছে। তাড়া খেয়ে কেউ দ্বীপে নির্বাসন নিয়েছে, কেউ নিজের হাতে বিষপাত্র তুলে নিয়েছে, কাউকে নীলাচলের সমুদ্রকে আশ্রয় মনে করতে হয়েছে। আত্মহত্যাই—তবু, হয়তো চৈতন্যদেব ভেবেছিলেন, পুরীর সমুদ্র যখন তাঁকে গ্রাস করছে,—তখন; 'বেঁচে গেলাম।'

আবার গুড্ডু চলে যায় জানলার শিকের পাশে। ওখানে পাতাবাহারের ঝোপের ভিতর একটা গাড়ি থেমে আছে, নড়ছে না। এদিকে ডাক পড়েছে। টানতে টানতে নিয়ে যায় গুড্ডুর মা। স্কুলের মানে প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানে যাবার জন্য পোষাক পরানো হল। মায়ের হাত ধরে সিঁড়িতে প্রথম যেন পা দিল। এখন অন্য এক গুড্ডুকে দেখা যাচ্ছে। গুড্ডুর মা, প্রায় অনাথকে যে দৃষ্টিতে চায়, সেই দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে তাকায়। বড় এক থালা মিষ্টির প্লেট নামিয়ে দেয় দিল্লী থেকে আগত ডিজাইনার, নাগরিক, কারুকলাপ্রবণ যোগেন্দ্র

প্যাঙ্গেলের সামনে। এর মধ্যে ক্যামেরা একবার 'ক্লিক্' করে উঠল। রাতের আলো এখন ঈশ্বরের চেয়েও বেশি আকর্ষক এবং সহায়ক। গুড্ডুর মুখে আবার আজব শব্দ। মুখে মারতে মারতে আবার কোথাও উধাও!

লাইফ স্টোরি নিয়ে প্রশ্নাবলী কাঁধব্যাগেই আছে। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে, বাংলা বন্ধের দুপুরে একটা অন্ধকার খুব পুরনো বাড়ি পাওয়া গেল। অস্থিত পোদ্দার, নাম বলতেই দরোয়ানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 'চারতলায়', খানিক অন্যমনস্ক হয়ে বলল। ঢুকে দেখি বিশাল চাতাল, যজ্ঞ হোম করার মতো, বা শতরঞ্চ পেতে দাবা খেলার মতো। শ্যাওলাধরা। চাতাল পেরিয়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। আলো ঢোকে না বোধহয় কোনোদিন। গা ছম্ ছম্ করে, তবু উঠে গেলাম। বাইরে তালা দেওয়া গ্রীলের দরজা। কড়া নাড়ার পরে বেশ সময় গেল। একটা বাচ্চা মেয়ে এসে গম্ভীর শান্ত মুখে বলল, 'কী চাই?'

'তোমার মা আছেন, বাড়িতে?'

'মা তো শুয়েছে।'

'বল, বিকাশ কেন্দ্র থেকে···' মেয়েটি পুরোটা না শুনেই চলে যায়। অন্ধকার থেকে এক মহিলা একেবারেই সাদা, ফ্যাকাশে—বেরিয়ে আসেন।

'কেন এসেছেন?'

'আমি অস্থিত এবং আপনার একটা ইন্টারভিউ নিতে চাই।' বলার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র একটা ঝাঁকানি খেয়ে যায়। চোখে যেন কিছু জ্বলে উঠে, বিঁধে যায় সোজা আমার চোখে,

'কার ইন্টারভিউ? আমার ছেলে দেড় বছর আগে মারা গেছে।'

আমি চমকে উঠি ভীষণ। লজ্জায় একেবারে দিক দিশাহীন হয়ে তোতলাতে থাকি '···না·····মানে·····আমি জানি না। বিকাশ কেন্দ্র আমায় কোনভাবে জানায়নি।' মহিলা একটু শান্ত স্বরে বলেন, 'আপনি বিকাশ কেন্দ্রে যান? গেলে, ভারতীদিকে বলবেন, আমার ছেলের আঁকা অনেকগুলো ছবি ওখানে পড়ে আছে। ওর নিজের হাতে নাম লেখা···ও যে কত···' —অস্থিতের মা মৃত অস্থিতের দুঃখে নয়, জীবিত অস্থিতের হাঁটা-চলা, আঁকা, কথার ক্যানভাসে চলে যায়। আমি কোনোক্রমে বলি, 'জানাবো।' আবার অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত

---

১ নামটি কাল্পনিক। মানসিক প্রতিবন্ধীদের বিশেষ শিক্ষণের একটি প্রতিষ্ঠানকেই এই নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।—সম্পাদক।

নেমে আসি। অঙ্কিত নামের ছেলেটিকে আমার দেখাই হল না—অথচ ইন্টারভিউ।

বিকাশ কেন্দ্র কি করছে? পাগলা দাশু, বুড়ো আংলার জগতে এই ছেলেরা হয়ত মাঝে মাঝে যেতে চায়। কথকের নাচের ধরণে থাকা সেই মেয়েটি—যার জিভ বার করা। লালা ঝরে পড়া, চোখ উল্টোনো, বাঁকা পা, সুপুরিসাইজের মাথা—মাঝে মাঝে গা বেয়ে ওঠে। নানান ভঙ্গীর বাচ্চা, এমনসব বাচ্চাদের নাচ শেখায় নাচের দিদিমণি। সে নিজে কথকের ঢঙে শেখায়, কথন কাঠবেড়ালির মতো নেচে ওঠে—সেও কি জানে না অঙ্কিতের মৃত্যু? বা জেনেও তাকে পরদিন নেচে যেতে হয়েছে, জীবিত বাচ্চাদের জন্য। হিসি করায়, ধোয়ায়, চুল আঁচড়ে দেয় যেসব আয়ারা—তাদের কাছেও কি এইসব বাচ্চা একটা অভ্যাস, একটা সংখ্যা? নাচের দিদিমণি মেক্সিকো ঘুরে এসেছে। যোগী প্যাঙ্গেলের ক্যামেরা এখানেও! যদিও কথকের দৃশ্য-জগৎ ক্যামেরার নয়, অঙ্কিতের মৃত্যু ও বেঁচে থাকাকে মনোজগতের কথক মুদ্রায় ধরে রাখা।

'এসব বাচ্চাদের সেলফ্ আইডেন্টিটি দরকার', যোগীর পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রঞ্জিনী বলে। ওদের সেলফ্ আইডেন্টিটি কি একটা অনাবিষ্কৃত জগৎ? তথাকথিত সামাজিক জ্ঞান, সামাজিক পরিচয়পত্র দিয়ে ওদেরকে বুঝতে পারব না। ওরকম একজন বাচ্চা আর একটি বাচ্চার খোঁজে বাইরে বেরোয়, বাথরুমে যেতে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে সাহায্য করে, দিদিকে বা ভাইকে মারলে আগলায়, বাড়িতে তার প্রিয় কোনজনের মৃত্যু হলে ভীষণ একাকী হয়ে যায়, তাদের মানবিক জগৎ আমাদের তথাকথিত সুস্থতার চেয়ে অনেকবেশি প্রাণবান নয় কি? আবার শূন্য থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চায়, কোথাও চোট লাগলেও ব্যথা প্রকাশ করেনা, গান এবং কোন গভীর সুরের জগতে তাদের চলাচল আমাদের চেয়েও বেশি। ঘুমপাড়ানি গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত তাদের জগতের ভাষাকে আরো স্পর্শকাতর করে তোলে। হয়ত পরিবেশ স্বাধীন হলে তারা নতুন সুরের সংযোজন করতে পারত। সুরের ধারায় তাদের স্বভাবের একটা অনায়াস বহে যাওয়া আছে।

অঙ্কিতদের পুরনো সিঁড়ি, শ্যাওলাধরা বিশাল চাতালে হয়ত অঙ্কিতের হিজি-বিজি শ্বাসপ্রশ্বাস নড়া-চড়া করে। দেড় বছর আগে মারা যাওয়ার পরও কি সাক্ষাৎ হতে পারে, সাক্ষাৎকার নেওয়া যেতে পারে? বিকাশ কেন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠান, যোগীর ক্যামেরা কি দৃষ্টিবানদের মতো ততদূর অন্ধ নয়, যেখানে বড়লোকের মেয়েরা শুধু পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়? গর্ভাবস্থায় প্রতিবন্ধী

বাচ্চাদের মায়েদের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে রঞ্জিনী গর্ভপাতের কথায় আসে। তার গলার স্বর অতি স্বাভাবিক বা অভিনয়ের মতো স্বাভাবিক। সমাজে গর্ভপাত, ভ্রূণহত্যা তো স্বতঃসিদ্ধ। আমার বুক প্রায় শুকিয়ে ওঠে। পচা পাপড়ির মতো শিশুদের মুখ ভেসে ওঠে। এসব গবেষণা তো আসলে যাদের খুনের স্বভাব আছে, তাদের পরিচয়ই প্রকাশ করে। সান্ত্বনা, তবু, শিশু শিশু-পৃথিবীতেই আছে, তার কল্পনার ভাষা এখনও অজ্ঞাত—নইলে যে কী হত!

ট্রেনের কামরায় মনশ্চরিত্র আসলে একটার পর একটা ছবি হয়ে দেখা দেয়। এঞ্জিনে জলা কয়লা বেনচায় তোলে লোকটি—যক্ষ্মাগ্রস্ত স্বরলের গলা চিরে সেই অস্বাভাবিক ধ্বনি ও স্বরতরঙ্গ বয়ে যায়, নাচও অন্তহীন, 'নদীভরা ঢেউ, জানে না তো কেউ। কেন মিছে তরী বাও, বাওরে।' তখন কি যক্ষ্মা হবার পরে, বিড়ি, গাঁজায় সামাজিক অবজ্ঞা মুছে দেবার জন্য কোন বাউল বিদেশে গেলে, বিদেশ থেকে শহরে ফিরে জিনস্ পরে গান গাইলে ধর্মহীন হয়ে যাবে? মৃত্যু ও জীবনের মাঝামাঝি হ'য়ে যাদের অহরহ বেঁচে থাকতে জানতে হয়, তাদের ধর্ম তারা আপন প্রাণশক্তিতেই রাখে, কোন সার্টিফিকেট বা অপব্যাখ্যা ছাড়াই। স্বরলের গানের সানে যে মেয়েটির শরীরছবি ভেসে ওঠে, সে তসলিম গড়িয়ালী। পার্কসার্কাসে একটা বাড়িতে তারা থাকে প্রায় সামাজিক চাপের ভিতর। কারণ তসলিম মানসিক প্রতিবন্ধী। তার বয়স তেরো। ফুলের মতো সুন্দর। সে অন্ধকার ঘরে থাকতে ভালবাসে। আর তার স্মৃতি বার বার ফিরে যায় ছেলেবেলাকার বম্বের সমুদ্রতীরে, বালুখেলায় আর সমুদ্র স্নানে। যেখানে সে বুঝেছিল, কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছে—আর পাঁচটা সাঁতারু সঙ্গিনীর মতো সে জলে নামতে পারবে না। হয়ত তার মনে হয়, সমুদ্রে নামলেই সে স্নান ছাড়া আর কোন ছবি দেখবে না। তাই তীরে দাঁড়িয়ে শুধু সে স্নানের দৃশ্য দেখে যাবে। তার চোখে হাওয়া বালি ওড়ায়—মনে হয় জলের ঝাপটা। মধ্যপ্রদেশের মেয়ে। মা কমার্শিয়াল আর্টের ছাত্রী ছিল। বিয়ের পর ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু বাড়িতে সেলাইয়ের অনেক ডিজাইন আঁকে। ঘরের নানান খুঁটিনাটিতে ছড়িয়ে আছে তার আঁকার মনস্কতা। তসলিম বিকাশ কেন্দ্র থেকে ফিরে সারাদিন তার মায়ের পেছনে ঘুর ঘুর করে। রুটি বেলে দেয়, ঘর গুছোয় আর মায়ের কাছে আঁকা শেখে। মাঝে মাঝে মুখে আঙুল দিয়ে অদ্ভুত আ-আ-আ শব্দ করে। পশু মায়ের মতো কাকে যেন ডাকে। মাঝে মাঝে দিদির বেণী ধরে টান মেরে উল্টে দেয়। আবার দিদির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। হঠাৎ হঠাৎ জড়িয়ে ধরে আদর করে। তারপর গম্ভীর

হয়ে অন্ধকার ঘরে চলে যায়। টেপরেকর্ডার চালিয়ে দেয়। যে সুর বাজতে থাকে তার সাথে তাল দেয়। 'আ-আ-আ', আবার দূর থেকে পশুমায়ের তার হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাকে ডাকার, খুঁজে ফেরার ধ্বনি হতে থাকে। জাহাজের একা নিস্তব্ধ অকম্প্র দীর্ঘপথযাত্রী কাপ্তেনের কানের মতো, আমার কান সেই দিকে যায়। এদিকে প্রশ্ন করি, ওর মাকে,

'স্বামী কী করেন?'

'হোটেল ম্যানেজার, আলিপুর চিড়িয়ানার উল্টোদিকে পাঁচতলা হোটেলে। বরাবর এই কাজে গুজরাট, শ্রীলঙ্কা, কলকাতা ঘুরে ঘুরে ফেরা।'

'শ্রীলঙ্কায় তসলিম কী করত?'

'ওখানেও সমুদ্র আছে। কিন্তু খুব একা হয়ে পড়ত। বন্ধু কেউ হয়নি। আবার চলে এলাম এই কলকাতায়।'

'আলিপুরে তসলিম কেমন কাটাত?'

'বেশ বড় জায়গা ছিল, অনেক সাথী ছিল।'

'এখানে?'

'এখানে তো একেবারে বন্ধ। বন্ধ আঁখ, বন্ধ দিল।'

পার্কসার্কাস মুসলমান এলাকা। প্রাচীন এবং আধুনিক দুই। রক্ষণশীলতার সৌন্দর্য কিন্তু প্রবাসী মুসলমানদের কাছে বটের ছায়া বা নদীজল এনে দিতে পারেনি। প্রবাসীরা বরাবরই বন্ধুত্বকামী, স্নেহভিক্ষু। একটা তাড়া খাওয়ার ব্যাপারতো থাকেই। একমাত্র মসজিদে প্রার্থনার সময় তসলিমের মা তসলিমকে নিয়ে বেরোন। দিদিও সঙ্গে যায়। দিদির ছায়ায় তসলিম হাঁটে। একটা গাছের চলমান ছায়ায় মিশে আর একটা উন্মোচনহীন গাছ। পথ যদিও 'গুরুতে, মুর্শেদে নয়', তসলিমকে উৎসুক জনতার 'পাগলী', 'খাসা', 'শাদি' কখন হবে না আর নানান ইত্যাদি, প্রভৃতির ভেতর দিয়ে মসজিদে, বিকাশ কেন্দ্রে যেতে হয়। অপ্রকৃতিসম্পন্না তসলিম স্কুল বাসে যখন যায়, তখন গুড্ডু, কুণাল, অমিতদের অভিভাবিকা শাসন করে, আদরও। একঢাল পিছছাপানো চুল, সাদা ফ্রকপরা তসলিম ওই 'আ-আ-আ' শব্দেই কলকাতা এবং সাথীদের শাসন করে চলে। কিন্তু সে বোঝে না—তার সাথী সত্যি কেউ আছে কিনা। গুড্ডু হঠাৎ বাসের দরজা খুলে দৌড়ে নামতে চাইলে তসলিম ব্যস্ত হয়ে আটকায়। গুড্ডু বোঝে মার মতো নয়, কিন্তু ওরকম মূর্তি এই সাথীর ভিতর কোথাও আছে। গুড্ডুর মুখে আঙুলের অস্থির আঘাত পড়ে। ফিকে হাসি দেখা দেয় তসলিমের মুখে। সেই তসলিম, আমি যেতেই ঘুম থেকে উঠে আসে। তার অনেক প্রশ্ন আমার

প্রতি। একটু পরখ করার মতো ঝুঁকে কাছে আসে, তারপর দূরে সরে যায়। তসলিমের মা বলে ওঠে,

'ও ভেবেছে আপনি বিকাশ কেন্দ্রের দিদিমণি। দিদিমণিদের ও খুব ভয় পায়।'

এখানে কোন ক্যামেরা নেই। তসলিম শুধু আমাকেই ছাখে। হেসে ফেলে তার অন্ধকার ঘরে আমায় নিয়ে যেতে চায়। সে আমার হাত শক্ত করে ধরে। শুধু অন্ধকার ঘর একবার দেখে ফিরে আসি। তসলিম একা বিমর্ষ মুখে তার ঘরে চলে যায়। আমি নিরুপায় হয়ে জানলার দিকে তাকাই।

বাজনার সুর কানে আসে। বোঝা যায় আত্মীয়তা আবার মেয়েটির ভিতর হানা দিয়েছে। ঝুটিবেলা, আঁকা, বাসযাত্রার ভেতর শাসন-আদরের আত্মীয়তাটুকু সে হারাতে চায়না। মাঝে মাঝে তার জগৎ থেকে হারিয়ে যায়—তার প্রতিবন্ধকতা এই। আবার সমুদ্র স্নানের জল ও শিশুসাথীজগৎ যদিও ক্ষীণ, তবুও তার সম্বল। তসলিমের মাকে জিগ্যেস করি,

'এরপর ? ওকে নিয়ে কি করবেন ? '

'কী করব জানি না। আমরা মরে গেলে ওর দিদি হয়ত দেখবে।'

'কেন, শাদি ? শাদি দেবেন না ?'

'কে শাদি করবে ? আর কী করে তা সম্ভব ? যে আপনা কিস্‌মৎ আপনি জানে না। নিজের চিন্তাও নেই।'

'কিন্তু আপনাদের সমাজ ?'

'সেহি তো ওর আব্বার ভাবনা।' এরপর তসলিমের মা কিছুক্ষণ চুপ হয়ে যায়। পরে বলে ওঠে, হঠাৎ এই ভাবনা থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য—'ওর আব্বা আবার কোথাও ট্রান্সফার হয়ে যাবে, তখন আবার কিছুদিন আচানক থাকা যাবে।'

ভয়ে শিউরে উঠি তসলিমের কথা ভেবে। শাদী হলেও এই মেয়ের ওপর অত্যাচার হবে। আর শাদী না হলেও সামাজিক অত্যাচার, অপমানের হাত থেকে রেহাই নেই। সারাজীবন তাড়া খেতে হবে দেশ-দেশান্তরে। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে শেয়ালদা স্টেশনে সাত থেকে ষোল বয়সী মেয়েরা—যারা মানসিক প্রতিবন্ধী। যাদের মাঝে মাঝে রাতে উধাও করা হয়। অনেকে মৃত অনেকে ঘোর উন্মাদ—পথে পথে যাদের দেখা যায়। একটা বীভৎস আতঙ্কে আমি তসলিমের মায়ের দিকে তাকাই। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। আমি ঝটিতি উঠে পড়ি আর সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে আসি।

এণ্টালির গলির ভেতরে খুঁজে-খুঁজে সঈদা বেগমের বাড়ি পাই। এই মেয়েটিকে দেখে দীপকদার কথার কোন বন্য শোকছন্দ খুঁজে পাই। বা বলা যায়, শোক ও বেঁচে থাকার মধ্যবর্তী কোন ছন্দ—যা পৃথক পৃথক আকাশ, গ্রহ, তারা হয়ে ছিটকে যায় দূরে, আবার বেঁচে থাকার প্রাচীন কোন টানে এখনকার পৃথিবীর সংঘাতস্পন্দনে গ্রথিত করে। তের বছরের কিশোরী সঈদাকে দেখে সেই বন্যতার চলমানতা একবার আমাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে যায়। বুনো ঝাঁকড়া চুল, কিন্তু ঘাড়ের কাছে ছাঁটা। একটা আলখাল্লার মতো কুর্তা গায়, কচমচ করে পান চিবোতে চিবোতে মেয়েটি আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখে, ঘাড় ঝাঁকায়। এখানে সবই মুসলমান পরিবার। একটা গলির ভেতর অনেকগুলি ছোট ছোট ঘর। সঈদা দৌড়ে যায় ওর মাকে খবর দিতে। এই মুখ গুঁজে পড়ে থাকা মানুষদের অস্তিত্বের কতগুলো সুতো খুঁজে বেড়ানো যায়। কিন্তু পুরোপুরি ধরা যায় না। এত বিচিত্র চিড়ধরা মনোপ্রকৃতি, এত ভিন্নগামী যে, চিহ্নিত-করণ সম্ভব নয়। এই জায়গা ছেড়ে চলে গেলে এরা প্রায় ছোট ছোট লোক-শ্রুতির মতো বেঁচে থাকবেন, হয়ত। সঈদার মা এসে গেছে। হেসে পরিচয় দিই। কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার হাসি মুছে যায়। এত প্রশ্ন, এত ধিক্কার সেই চোখে—বুঝে উঠতে পারি না। শুধু স্বর শুনি, 'কী চান? আমার মেয়ের নাম বিকাশ কেন্দ্রের খাতা থেকে কেটে দিয়েছে। এত সাধলাম। গরিব মানুষ। কোথায় রাখব? কী করব, কে দেখবে, আমি আয়ার কাজে চলে যাই। শুনল না।' এতক্ষণে বুঝতে পারি। বিকাশ কেন্দ্রও গরিব মানসিক প্রতিবন্ধী, বিত্তবান মানসিক প্রতিবন্ধী চেনে! মানসিক প্রতিবন্ধীরও আবার শ্রেণী বিভাজন! বিকাশ কেন্দ্রের তিনতলা থেকে সেদিন একটি ছেলে দৌড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ছোট ছেলে তাকে খুঁজতে চলে আসে। সে বোঝে, বিকাশ কেন্দ্র ছেড়ে দিয়ে যত্ন নিতে জানেনা, আবার বাইরে রাস্তায়ও কেউ তাদের ছেড়ে দেবে না, স্বাভাবিক চোখে দেখবে না—যে ভালোবাসার চোখে ছোটদের সবাই দেখে, তা তাদের ভাগ্যে নেই। অপরিণত মন, প্রতিবন্ধী বাচ্চারা লোকের চোখে অনেকটা জারজ শিশুর মতো—করুণা, দুরত্ব, মস্করা, নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু নেই। মা বাবারা আবার সেই সমাজে বাচ্চাদের সামাজিক করে তোলার চেষ্টা করে যায়। সারাজীবন বাচ্চাদের সঙ্গে অভিনয় করে যায়। যদিও এটা মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সমাজেই বেশি। আশ্রয়হীন, নানান অবস্থানে তাড়া খাওয়া সঈদা বেগমের মা নয়। তাদের অন্তত আত্মসম্মান আছে, অভিমান আছে, আর বাচ্চাদের প্রতি নিরভিনয়

ভালবাসা ও ক্রোধ সমানভাবে আছে। মাথা নীচু করে সঈদার মায়ের ভর্ৎসনা শুনে নিই, সয়ে নিই। খুলে বলি তাকে, আমার বর্তমান অবস্থার কথা, চাকরি যাবার কথা। আস্তে আস্তে তার চোখের দৃষ্টি শান্ত হয়ে আসে। সঈদা শুধু ঘুর ঘুর করে আমার চারপাশে। এবার আমার হাত ধরে খাটে বসায়। একে একে গল্প হয়, আমার দেশের, সঈদার দেশের। সঈদার মা অবিভক্ত পাকিস্তানের। চট্টগ্রামের মেয়ে। একটি ছেলের প্রেমে পড়ে তার সঙ্গে পালিয়ে আসে কলকাতায়। কারণ বাড়ির মত ছিল না। শাদি হয় এখানে। পাকিস্তানে দাঙ্গার পরে উদ্বাস্তু, আত্মীয়-স্বজনরা এসে এখানে স্বামীর বাড়ি দখল করে। পরে সঈদার মা বাবা এই বাড়ি থেকে উদ্বাস্তু হয়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। সঈদার বাবা রাজমিস্ত্রি। হন্যে হয়ে ঘর খুঁজতে খুঁজতে এণ্টালির গলি। এখানেই সঈদার জন্ম। জন্মদিনের অনেক ছবি দেখায় সঈদার মা। ফুলে ভরা, স্বাস্থ্যে লাবণ্যে ভরপুর একটা বাচ্চা। সঈদার মা ভাবতেই পারেনি সেই বাচ্চার ভবিষ্যৎ এমন দিকে যেতে পারে। সঈদার স্বাস্থ্য এখনও শেষ হয়ে যায়নি। ঝাঁকড়া চুল, বড় বড় চোখ ঈষৎ সুর্মা টানা। শুধু ডান বাহু ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। হঠাৎ এসে আমার কোলে মুখ গুজে হাঁটু মুড়ে বসে রইল। 'তুমায় যেতে দেওয়া হবেনা' বলে, কোলে মুখ ডুবিয়ে মাথা ঝাঁকাতে থাকে। আমি হকচকিয়ে যাই। এমনটা ভাবিনি। একটা গভীর কিছু নাড়া দেয় আমায়, আচ্ছন্ন করে একটা ব্যথা বোধ। যে মেয়েটিকে কিছুই দেবার নেই আমার। আমি ইণ্টারভিউয়ার, দর্শক! কিছুক্ষণ পরে চলে যেতে হবে। এই মেয়েটির সামনে সবটাই অচিহ্নিত, অনিশ্চিত। নাড়া খেয়ে যেন জেগে উঠি। বেঝাতে চেষ্টা করি। ওর মা টেনে সরায়। 'দিদিকে চা দে, গেলাসে করে', বলে। ঝটিতি উঠে দাঁড়ায়। বড় বড় চোখ করে আমায় দেখে। তারপর মাথা নীচু করে খাটের নীচে ঢাকা গেলাস তুলে নিয়ে আমার হাতে দেয়। ফেরার পথে গলি ঘুরে অন্ধকার ছাড়িয়ে কালো একটা ঘুড়ির মতো মাথা দোলাতে দোলাতে সঈদা বলে যায়, 'তুমি আসবে তো···আবার তুমি···আসবে তো?'

এই অব্দি এসে, গলির নিষ্প্রভ আলো, জমাট শরতরঙ্গ, দৃশ্যবসতি তাড়া খাওয়া থেকে মুক্তি দেয়। শিয়ালদার মুখে মোড় নিতেই অনেক ধাতব, জটিল মুখে পশুব্যক্তিত্ব। আবার তাড়া খাওয়ার একাকীত্ব ছেঁকে ধরে। ঐ মুহূর্তে আমি ইণ্টারভিউয়ার নই, কবি তালেখক নই, দর্শক নই—আমাকে পালিয়ে যেতে হবে এই ধাতব-পাথর জগৎ থেকে, লেখকদের আড্ডা থেকে, কর্মীদের দ্বন্দ্ব থেকে, বিরহ থেকে, চলে যায় গোছের চোখের দেখা সামাজিক করুণা থেকে। আমিও

তাড়িত, ছিন্নমূল। ঈশ্বরের দিকে ধাবমান আমার নৈরাজ্যবোধ। নারী স্বাধীনতার পদাধিকার পাওয়ার ঝোঁকও আমার নেই। আমি শুধু মানুষ। দেশান্তরী।

'সব মানুষেরই পাগল হওয়া উচিত, অথবা উন্মাদ হওয়াই আনন্দ'—হেরোইনে নেশাচ্ছন্ন, ঘন ঘন ইংরেজী বলা একজন বলে উঠলে, আমি বিস্মিত হই। বলি, 'নিজের বাড়িতে কাউকে পাগল হতে দেখেছেন? অনেকদিন তাদের কাছাকাছি কাটিয়েছেন?' ছেলেটি স্মার্টলি অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। তারপর অ্যাসাইলামে থাকা ও হাংরিতত্ত্বমেশানো একটি লেখা পড়তে থাকে। বুঝতে পারি, এর দৌড় বই পড়া, নেশা করা এবং একটা পচা তত্ত্ব অব্দি। এখান থেকেই প্রায় উন্মাদকে পড়তে শিখেছে। ঠাস্ করে একটা চড় লাগাতে ইচ্ছে করে। কোন কাছের মানুষ পাগল হলে, তা যে কি মর্মান্তিক যন্ত্রণার, রাতদিন। যে পাগল হয় তার যন্ত্রণা, যে কাছে থাকে, বেশি যন্ত্রণা তার। লোকের তামাশা, ঘৃণা কোথায় গিয়ে পৌছায়—তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। কিন্তু উন্মাদ জগতের একটা ভাষা আছে, তা বিচ্ছিন্ন দুঃখেরও নয়। আনন্দেরও নয়। তার স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বুঝতে হবে। তার অস্ফুট ব্যঞ্জনাগুলি, তার উন্মেষের ইচ্ছা, তার ধ্বনিতরঙ্গ, শরীরছন্দকে যাতায়াতের পথ করে দিতে হবে। তারজন্য আমাদের প্রশ্নশীল, ধৈর্যশীল, ভালবাসা সক্ষম প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে এদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে। যোদ্ধা, ভবঘুরে, সুফি, ফকিরদের, লোককারিগরদের পথসন্ধান বলতে পারি। তাঁদের চলা এইদিকেই।

এমনটা হলে সঈদা বেগম, তসলিমের পথ অনেক সংবরণের আনন্দ পেত। কিন্তু সমাজ ও লোকপ্রকৃতি একভাষা নয়, এক অবস্থান নয়। এই দ্বন্দ্বে আরও প্রশ্নের ভিতর নিয়ে গেলে, কমলকুমার মজুমদারের 'তাহাদের কথা'-য় জ্যোতি আর তার দিদি তার বাবাকে খুঁজে বেড়ায় আর মাঠের প্রান্তে তার বাবা নরকপালে মুখ ঢেকে শ্যামাসংগীত গায়, কামারশালে কারিগর লোকটি জ্যোতির মায়ের সামনে জ্যোতির পাগল বাবার জন্য শেকল তৈরি করছে, আর ঘুম ভেঙে জ্যোতি দেখার চেষ্টা করে, তার দিদি, তার বাবার পায়ে শিকল পরিয়ে 'তালা লাগাতে ব্যস্ত', এই দৃশ্যগুলি মাথার ভিতরে বার বার প্রবল ঢেউ-এর মতো এসে আঘাত দেয়, তারপর আছড়ে পড়ে, কিনারাহীন কালো সমুদ্রে। রাজনৈতিক জনগণ মেশিন প্রসেসের সঙ্গে থেকেও মেশিনের উল্টোদিকে আর একটি মুখ, আর একটি সন্ধান দিতে শুরু করেছে। প্রান্তিকপ্রকৃতিবাস্তবতা আমাকে সমস্ত প্রশ্নকীর্ণ পথে প্রাণগুলিকে চিনে নিতে সাহায্য করে। এর জন্য, এমত

জটিল পরিস্থিতিতেও বেঁচে থাকতে পারছি। 'সুহাসিনীর পমেটম'-এ যে মেয়েটির গাল চমকায় আর তার শিশুটি আঁকা নয়, আমাদের কোথাও না কোথাও সত্য।

পুরনো বন্ধুরা সরে যাচ্ছে। আর আমার ভূমিকাটা অনেকটা বিস্মিত প্রশ্নকামী বকের। সমস্ত সম্পর্কগুলি জটিল সুবিধামায়ার দিকে, তবু ভালবাসার ইচ্ছা থেকে যাক—এ এক অবাধ্য নিষ্ঠুরতা। অতি কর্কশ মধ্যবিত্ত জগৎ পাগলকে পাথর ছোঁড়ার মতো সমস্ত মানুষকেই ঠাট্টা ও করুণায় নিয়ে যেতে পেরেছে। এটাও প্রায় এখন প্রচলিত। আবার ঘুরে আসি গুড্ডুর মায়ের কথায়, 'একটা বাচ্চাকে তার মা নর্মাল স্কুলে দিয়ে আসত। সেই স্কুলে বাচ্চাটি ঘুমিয়ে পড়ত। একবার পেচ্ছাব করে ফেলে। সেই থেকে লুকিয়ে, স্কুল চলাকালীন শিক্ষিকারা রোজ সেই বাচ্চাটাকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিত। ছুটি হলে দরজা খুলে বের করে নিয়ে আসত, কেউ টের পাবার আগেই। একদিন বাচ্চাটির বাড়ির আয়া এসে দেখতে পায়।' গুড্ডুর মায়ের মাইনাস পাওয়ারের চশমা আর গলায় স্বর ক্রমে ভৌতিক লাগে। আমি ভাববার চেষ্টা করি, দরজা বন্ধ থাকাকালীন বাচ্চাটা বাথরুমে কী করত? কাঁদত? মাথা ঠুকত? ছিটকিনি খোলার চেষ্টা করত? এক কোণে মুখ গুঁজে বসে থাকত, ভয়ে? গিরগিটির মতো জানলা, দেয়াল বেয়ে বেরোবার পথ খুঁজত? নাকি তার মায়ের মুখ বা আর কারো মুখ মনে করে মনে-মনে একটা অবলম্বন পেত? জানিনা। আর যদি দম বন্ধ হয়ে মারা যেত। মুহূর্তে আমার সমস্ত রক্ত চলাচল যেন থেমে যায়। সংবাদপত্রে ছবিসহ বেরোত। কিন্তু কেউ তো সংবাদপত্রে ছাপা হয়ে বেরোনোর বাইরে বেঁচে যায়। এই ঘটনা কি আমার মাথার ভিতর ক্রমাগত পেরেক ঢুকিয়ে দিচ্ছে না? এখানে কি আমি সমাজকর্মী? এর বাইরে আমার কী করার আছে? বাচ্চাটির মা বা সেই স্কুল শিক্ষিকা—আমি যদি হতাম, কী করতাম, নিজের টুঁটি চেপে ধরতে ইচ্ছে হয় বেদের হাতে টুঁটি চেপে ধরা সাপের বিষদাঁত ভেঙে যাবার মতো। এই বিষ আমি কিছুটা ঝেড়ে ফেলতে পারি, সবটা নয়। মধ্যবিত্তদের আধভাঙা বিষদাঁত বয়ে বেড়াতে হয়। আমি এমন মধ্যবিত্ত হতে চাইনা। কসবার অনিন্দিতা যখন কোথা থেকে ক্ষ্যাপার মতো এসে আমার কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল এবং সজোরে চুলের মুঠি ধরে মাটিতে পেড়ে ফেলতে চেয়েছিল, তখন তার বাবা-এসে ঝাঁকুনি দিয়ে মেয়েটিকে একবার শূন্যে তুলে নামিয়ে ঘরের বার করে দেয়।

তখন একটা অসহায় অবস্থা দেখা দেয়। এটা একটা মানসিক প্রতিবন্ধী বাচ্চার পক্ষে চূড়ান্ত নির্মমতা। ইতিমধ্যে অনিন্দিতার মাও এসে গেছে। দুজনে চেয়ারে বসেন। এতক্ষণে একটা জ্যামিতি রচিত হয়েছে। এরপর অনিন্দিতার বাবারগলা শোনা যায়, 'আগে বাবা-মাকে লিবারেল হতে হবে, তাদেরই আগে মানসিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে হবে। আমরা এদের দিয়ে যৌথখেলাধুলোর প্র্যাকটিস করাতে ভিক্টোরিয়ার মাঠে নিয়ে যাই' ইত্যাদি, ইত্যাদি শুনে যাই। চেয়ারের সঙ্গে প্রায় চেয়ার হয়ে যাওয়া। এ মুহূর্তে অনিন্দিতা যদি চেয়ারটা সরিয়ে নেয়। পরমুহূর্তে অনিন্দিতার ক্ষিপ্র বেগে প্রবেশ এবং কিছু বোঝবার আগেই, ঘরের সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়। আমার খাবারের প্লেট থেকে খাবা মেরে ডিমভাজা তুলে নেয়। সারা ঘরময় লাফ দিয়ে পড়ে ডিমভাজা খেতে থাকে। একে এখনই এই চারতলা সরকারী ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে ঝুপড়িবাসী পথবাসী মা ও বাচ্চাদের মধ্যে। ছেড়ে দিতে হবে কোন দ্বিরুক্তি না করেই। একমাত্র তারাই ওর কাছাকাছি আসতে পারে। তাদের অভুক্তি, তাদের মুক্ত স্বভাব, মেয়েটিকে মানবিক দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং তাদের বন্ধুত্ব প্রতিবন্ধী মধ্যবিত্ত গোলকধাঁধার বাইরে কোন স্বাভাবিক পথে নিয়ে যেতে পারে। বলার ইচ্ছে থাকলেও বলা হয় না। কেননা ওই ফ্ল্যাটবাড়ি, কাঠের সঙ্গে কাঠ হয়ে যাওয়া অনুভূতিগুলি আমার গলা চেপে ধরে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ কোন নস্টালজিয়া নয়। বহুদিন ধরে দেশান্তরী, বহুদিন ধরে এই শহরে বাস। সংস্কৃতি, প্রেম, সামাজিক কাজ, লেখালেখি, অভুক্তি মেটাতে কিছু খাওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উল্টোদিকে প্রায় উল্টানো পাঁচনম্বরের মতো হাসি, যা কিনা কবির, যা কিনা অফিসের। যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার কোন প্রেরণা নেই। শুধু নিজের মুখ ক্রমে ম্লান হতে থাকে, ম্লানতাকে ঢাকার জন্য কিছু অন্ধকার খুঁজতে হয়, আর 'হাঁ···না মানে হাঁ···এরকমই তো হয়' এরকমই হতে হয়।' চারিদিকে কবি। তোতলাতে তোতলাতে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে ফেলি। এমতাবস্থায় নিজের ব্যর্থতাবোধ ঢাকতে টেবিলের পায়ার কোন সামান্য অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়।

গ্রামে পাগল, ক্ষ্যাপা, অর্ধবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা মা, ঠাকুমা, পিসিমার আশ্রয়ে থাকত। পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপ, শিবস্থান পীরদরগা—এসবের সঙ্গে মিশে থাকত যদিও বঞ্চনা তাদের ভাগ্যেও জুটত। তবু এতটা বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েনি। অপরিণত বুদ্ধির ছেলে-মেয়েদের বিয়েও হত। তাদের স্ত্রীরা অনেকটা বেশি স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে সম্পর্কটাকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করত। এখন গ্রামও বিচ্ছিন্নতা ও অস্থিরতায় আক্রান্ত। ডুবো মানুষকে চুলের মুঠি ধরে

ডাঙায় তোলার কারো মন নেই। তবু ঠাকুমা, জেঠিমা, ঠাকুর্দার একটা প্রবহমান স্মৃতিজগৎ থাকে, যা তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কিছু না কিছু থেকে গেছে। আর আমরা তো আদিবাসী প্রবাহের উত্তরাধিকারী, তাই রক্তের ভিতর এসব মানুষের প্রতি ভালোবাসা বয়ে বেড়াই। শহরে কেউ কেউ এদের জন্য বেদনা অনুভব করে, কিন্তু শহরের সামাজিক নিয়ম মানুষকে রক্ষা করার, আশ্রয় দেবার স্থির অনুভব সঞ্চার করতে দেয় না মানুষের ভেতর। শুধু যন্ত্রণা বাড়ায়, শুধু বিচ্ছিন্ন করে। প্রতিদিন স্টেশনে, পথে লক্ষ জনস্রোতের ভিতর দিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে গ্রাম ও শহর, পরস্পরকে বুঝতে হয়েছে। ভিখিরি, পাগল, হাবা, আধ পাগলদের থেকে আলাদা থাকার সুবিধা পেতে চেয়েও আলাদা থাকতে পারছে না। বরং অতি স্বার্থপর লোকেরাও প্রতি চোখে ও মনে আক্রান্ত হতে হতে বুঝেছে। ক্রমে তারা সহনশীল হতে শিখছে এবং তাদের নেতিবাচক উপেক্ষা অনেকটা কাছাকাছি আনতে পেরেছে। কারণ তাদের নিজের পরিবারেও এই ধরণের শিশু ও বড়রা আছে। তাদেরকে কিছুটা সইয়ে নিতে গেলে, তাদের বাবা, মা হতে গেলেও অন্তত স্বাভাবিক সত্যের খাতিরে এদেরকে কিছুটা স্বাভাবিক চোখে দেখতে হয়, পাশাপাশি চোখে চোখ রেখে হাঁটতে হয়। এই বুনন থেকে যারা বিচ্ছিন্ন, তারাই ঐ নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষিকা যাকে তার নিজের পজিশন রাখার জন্য একটি শিশুকে বাথরুমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধ করে রাখতে হয়। হয়ত এই শিক্ষিকা নিজের বাড়িতে নিজের শিশুর মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখতে ভয় পায়। বড় বড় বাড়িতে কুকুরকে স্নান করানো হয়, আদর করা হয়, কিন্তু প্রতিবন্ধী মানুষ এই সম্মানও পায় না। মানুষের ইচ্ছা কিংবা শুভেচ্ছা, সবই দেয়ালের এপারে। দেয়ালের ওপারে গিয়ে পৌছয় না। আমরা কেউই এই দেয়াল সরিয়ে দিতে পারিনি। বার বার খণ্ড খণ্ড হওয়া। সমগ্রের দিকে কোন অভিপ্রায়, কোন দৃষ্টি নেই। যেমন রাজনৈতিক সমাধানসূত্র, 'খুনের বদলা খুন', যা সৃজনশীলতার বিরুদ্ধে বিভাজনকামী। জাতি স্বাতন্ত্র্য রেখেও লোকসাধারণী উপায়ে সকল মানুষের, সকল সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্যের যোগসূত্রে পৌছনো যায়—যা যে কোন প্রাণকে, প্রাণের ব্যঞ্জনাকে সর্বদাই আমন্ত্রণ জানাতে ইচ্ছুক। একথা প্রায়শই অনুভব করেও দেখতে পাই, 'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি। আজ চোখে দেখে তারা।'

কুণাল সিংহ ডুগারের বাড়ি লোয়ার সার্কুলার রোডে দেওদার স্ট্রিটের পাশে, খুব পুরনো, ইংরেজ আমলের বাড়ি। কাঠের সিঁড়ি ও বারান্দা। ইংরেজ আমলে

বিজয় সিংহ ডুগারদের পরিবার। একদা মুর্শিদাবাদে বসবাস। তারপর অনেক পথ ঘুরে এখানে। কুণাল এই পরিবারের ছেলে। তার জেঠামশাই শান্তি সিংহ ডুগার কোনভাবেই ভাবতে পারে না, ডুগার পরিবারের ছেলে মানসিক প্রতিবন্ধী। সিরাজউদ্‌দৌলার আমল দেখেছে এই পরিবারের পূর্বপুরুষ। যারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরি করেছে আবার গোপনে ইংরেজ বিরোধী রাজবিদ্রোহী বাহিনী তৈরি করেছে। জমিদারি গেছে। শুধু এই প্রাচীন বাড়ি টিকে আছে। সেই পরিবারে বিদ্রোহীর পরিবর্তে প্রতিবন্ধী জন্ম নিয়েছে। ঘরের বাইরে বারান্দায়, যেখানে সেখানে পাথরের রুক্ষ মূর্তি যেন—চলাফেরা করে অস্থিরভাবে এই পরিবারের খয়েরী-লাল চুলের পুরুষরা। কোল্ড ড্রিংকসের দোকান ও কারখানার ম্যানেজারী—এই তাদের হাল-হকিকৎ।

কুণালের প্রিয় ফুটবল। বাগানে অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলে বেড়ায় কুণাল। হঠাৎ তাকে দেখা যায় পাঁচিলের ওপর, গাছের ডালে চড়ে বসে আছে। নামছে না। সন্ধ্যায় ছেলেরা এসে খোঁজ দিয়েছে বাড়িতে। কখনো কখনো দেখা গেছে লোয়ার সার্কুলার রোডে দাঁড়িয়ে হাত তুলে গাড়ি থামাচ্ছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে। হো-হো করে হাসছে। আমাকে কিছুটা চেনে। দেখে একটু অন্য হাসি দেখা যায় তার মুখে। সে বিকাশ কেন্দ্র, কিংবা ডুগার পরিবারের কেউ নয়, যেন সে হঠাৎ বাইরে থেকে এসে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের তারাপদর কথা মনে পড়ে যায়। তারাপদকে আমরা কাছে পেয়েও পাইনি। সে, হঠাৎ এসেছিল—সে হঠাৎ চলে গেছে, এক ঝড়ের রাতে। কুণাল সেরকম আর এক তারাপদ, যে একেবারে চলে যায় নি সংসার থেকে, শুধু কখন তাকে রাস্তায়, কখন গাছের ডালে, কখন তাকে খেলায় দেখা গেছে। কখন তাকে বিকাশকেন্দ্রের সিঁড়িতে। বলা ভাল, তার মতো সে বাঁচতে শিখেছে। তার ভাষা সে কাউকে হয়ত বোঝাতে পারছে না। এখন এই প্রতিবন্ধী কিশোর কোন্ অর্থনীতির ওপর দাঁড়াবে, ডুগার পরিবারের কর্তারা তারই ভাবনায় পড়েছে। কুণাল যদি খেলা ভালোবাসে, ভবিষ্যতে তার জন্য অর্থ চাই। কুণালের জেঠামশাই একবার গম্ভীর মুখে পিতৃ-পিতামহের সিঁড়ি বেয়ে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির দিকে ফিরে যান। দেখতে পান, সিরাজউদ্‌দৌলা একটু ঝুঁকে পড়ে ভাবছেন, বাংলা তথা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কারা? জগৎ শেঠরা, না ইংরেজরা। উচ্ছৃঙ্খল নবাবের চেয়ে বিদেশী টাকা, সাদা চামড়া অনেক ভাল, ভেবেছিল সেকাল, আর একাল চেয়ে আছে বিশ্বব্যাংকের দিকে। পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ প্রতিবন্ধী, ইংরেজের ভাষায় যাকে বলে ডিসেইবলড্। প্রকৃতি এবং অন্তর্জগৎ মিলিয়ে যে শিশুরা প্রায় অথৈ নদী তাদেরকেও মাপা

হবে বিশ্বব্যাংকের দাঁড়িপাল্লায়। আমরা সময়ের পরিবর্তন ও জটিল টানা-পোড়েনের সঙ্গে লোকপ্রকৃতিকে মিলিয়ে নিতে পারিনি। যে যোগ থাকলে পরে এমন করে প্রাণের বিরুদ্ধে, আত্মঘাতের স্বপক্ষে মানুষ যেতে পারত না। প্রতিবন্ধী সমাজ, হরিজন সমাজ, দলিত সমাজ, লেখক সমাজ, পার্টি সমাজ— এরকম, গান্ধারীর অখণ্ড গর্ভ কেটে খণ্ড খণ্ড গর্ভপিণ্ডের মতো সমাজের জন্ম হতনা। এই দেখে যাওয়া, সয়ে যাওয়া, 'না এলেই ভালো হত অনুভব করে। এসে যে গভীরতর লাভ হল সে' সব বুঝেছি।'

ছেলেবেলা থেকেই নাথ, কাহারদের ছেলেমেয়েদের যক্ষ্মায়, জণ্ডিসে মারা যেতে দেখেছি। গর্ভপাতে মরতে দেখেছি মেয়েদের। 'ওদেরতো ওরকম হয়ই', এরকম কথা শোনার পরে, এত মৃত্যুর পরেও তারাই জীবনের সবচেয়ে নিকটে থেকে গেছে। তাদের একটুকরো ভিটে ভরে রয়েছে আম, জাম, শিরীষ গাছে। জবা ও ঝিঙে ফুলে উঠোন ভরে গেছে। বিছানার পাশে কালো চোখে গাভী আর তার দুধের ধারা। আর সন্ধ্যায় তাদের বাচ্চাদের জোনাকির সাথ ওড়াউড়ি, জামার ভিতর প্রদীপ জেলে, হাওয়া থেকে বাঁচিয়ে পুকুরের জলে কলার ডোঙায় ভাসিয়ে দেওয়া। এসবতো তাদেরই পৃথিবী। আর আমার মায়ের শ্লেষ্মা হলে গাছ শেকড়ের রস দিয়ে ওষুধ বানিয়ে দিত নাথবউ। অসুখ বাড়াবাড়ি হলে ঝড়জল ঠেলে ডাক্তার ডেকে আনত, সারারাত ধরে ঘুঁটে জেলে ঠাণ্ডা শরীরে সেঁক দিত। উদ্বেগে চেয়ে বসে রাত জেগে কাটাত। সেই ভালোবাসা আর কোথায় আছে? কিন্তু এখনও, তারাই 'অন্ত্যজ', 'হরিজন', এই পরিচয়েই আমাদের কাছাকাছি থেকেও আমাদের থেকে অনেক দূরে সরে আছে। এরাই আমাদের অগস্ত্য। বিদেশীদের মতো শাসন করে সমুদ্রকে থামায়নি, দূরে সরিয়ে দেয়নি, এক গণ্ডুষে পান করে নিজের ভেতরে নিতে পেরেছে চিরকাল। প্রান্তিক আত্মীয়দের এভাবে সহজ অনুভবের ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের জীবনের কাছে টানতে পারিনি। এরকম কোন আলো আমাদের দৃষ্টি এখনও পায়নি। তাই প্রতিবন্ধী, দলিত, লেখক, হরিজন, বাউল হয়ে থেকেছি, সত্যের অপলাপ করে চলেছি। যে অনুভূতিতে পৌছে মতিলাল পাদরী বলতে পেরেছিল, 'আমি সত্যই ক্রিশ্চান নাই গো বাপ্!' অথবা কি কমলকুমার মজুমদার নিজেই এই সত্যের আলোয় পৌছেছিলেন?

মুখে লালা ঝরছে, চোখ আধ বোজা, গলার কাছে নীল শার্ট ভিজে উঠেছে, বছর এগারোর ছেলেটি মজার সরল হাসি হাসে। 'অমিত' বলে ডাকার পর

কিছুক্ষণ কেউ নেই। তারপর ছেলেটি উঠে আসে। আবার সবার দিকে তাকিয়ে সেই হাসি হাসে। তার গলায় কালো সুতোয় বাঁধা ছোট্ট একটা ঘুঙুর মৃদু বেজে ওঠে, ছেলেটি যেন মুহূর্তে দূরে চলে যায়, দিদিমণি বলে,

'অমিত, সেই কবিতাটা শোনাও তো।'

'উঁ', আবার সেই দূরে জলে ডোবা স্বর ও ঘুঙুরের শব্দ। দূর থেকে হারিয়ে যাওয়া গরু ফিরে আসার সময়, যেমন তার গলায় ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়, তেমন। অমিত একটু প্রায় পিছনের দিকে হেলে দাঁড়ায়, তারপর আরো ধীর, জলে ডোবা স্বরে বলতে থাকে,

'এসেছে শরৎ হিমের পরশ'

'অত আস্তে না,' দিদিমণি বলে। তখন আরও আস্তে হয়ে যায়। অবিরল লালা ঝরে পড়ে। অমিত টলতে থাকে। চারপাশে দশ-বিশজন বাচ্চার অঙ্গ-ভঙ্গী, মুখের ঝোল, চোখ উল্টানো, ডিগবাজি খাওয়া, গানের মতো জড়ানো কিছুর জান্তব ধ্বনি উঠতে থাকে। অমিত এবার একটু স্থির হয়ে, মাথা কাৎ করে গায়, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে···।' 'সকল অহংকার হে' বলার সাথে সাথে হেঁচকি ওঠে, তারপর গলা একেবারে ডুবে যায়, 'ডুবাও চক্ষের জলে।' আয়া দৌড়ে এসে তোয়ালে দিয়ে লালা মুছিয়ে দেয়, 'আর না, থাক, দেখলেন তো'। হ্যাঁ, দেখলামই বটে। শুনে যে ভালোবাসা এমন অন্ধের মতো ধাবিত হয়, দেখার জায়গাতেই ধাক্কা খেয়ে সেই আকুল জলরাশি রুদ্ধ আক্রোশে ফিরে আসে। দিদিমণি যখন ট্রেন চলার শব্দময় দৃশ্য নেচে ও গেয়ে দেখায় তখন বাচ্চারা উথলে উঠে এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তাদের আনন্দের দিকে ধাবিত হতে গিয়েও পারি না। যোগী প্যাঙ্গেলের ক্যামেরা আবার অন্ধের হস্তীদর্শনের উদ্দেশ্যে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে অ্যাঙ্গেল, পজিশন ঠিক করে; 'ক্লিক' করে শব্দ ওঠে। এর মধ্যে ট্রেনের ছবি গেছে। ক্যামেরায় আটকে পড়েছে দিদিমণি এবং স্যাম্পল প্রতিবন্ধী বাচ্চারা। ফিরে আসছি, বিকাশ কেন্দ্রের সিঁড়িতে অমিতের মা, একটু ম্রিয়মান, একটু উৎসুক গলা,'যাবেন বাড়িতে?'

'যাব, অমিত কখন বাড়ি ফিরবে?'

'আজ ভিক্টোরিয়ার মাঠে খেলার প্র্যাকটিস আছে।'

'এমন হল কী করে?'

'আসুন না, বলবখন।'

যোগী গর্ভাবস্থার কতগুলো ছবি এঁকেছে। প্রাইভেট সেক্রেটারী রঞ্জিনীর আবার চিবোনো গলা,

'অ্যাকচুয়ালি মায়েদের কনসিভ করার সময়টা সম্পর্কে তোমাকে আরও ইন্টারভিউ নিতে হবে। কোন ফিজিকাল বা মেণ্টাল টর্চার হলে, কী কী ব্যবস্থা নেয়……'
এই রে, যোগীর পার্সোনাল সেক্রেটারিও কি ফেমিনিস্ট নাকি! এরপর বলবে, কতদূর অত্যাচার এবং ডিভোর্স। অতদূর অভিজাত নই। এখন বাচ্চাটিকে আমাদের পাশাপাশি এক সন্ধানের, সুখ-দুঃখের শরিক বলে ভাবতে পারি কিনা, কিংবা সে কোন জগৎ পেলে স্বাভাবিকভাবে তার নিজের মতো করে বাঁচতে পারে, তার উৎসগুলি, তার সংকেতগুলি খুঁজতে চাই। যোগী পাবলিকেশন কস্ট বার করতে এবং কমার্শিয়াল আর্টিস্ট খুঁজতে ব্যস্ত। গর্ভাবস্থার ছবিগুলির ওপর স্টাইলিস্ট সেক্রেটারির রঙ ছোপানো নখ বোলানো দেখতে ভাল লাগছে না। আমি এখনই এখান থেকে বেরোতে চাই। আজ আকাশটা কেমন? আজ শুধু আকাশ দেখা—ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে আসি। যোগীদের সিঁড়ি এত শ্বাসবন্ধ, কিন্তু ঝকঝকে পরিষ্কার। আমি আকাশের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সিঁড়ি শেষ হয়ে যায়। আর মনে পড়ে যায়, কাল রবিবার।

প্রাকৃতিক পরিচর্যার চেয়ে মানসিক প্রতিবন্ধীদের বাঁচাতে মেণ্টাল থেরাপি, টেগরিটাল টুহানড্রেট, লুমি নেলেট্ দিয়ে, অন্ধের রাত্রিদিনের মতো এদেরও রাতদিন সমান করে দেওয়া হয়। দিনের আলোর সজীবতা, আর রাতের নিবিড়তার স্পর্শ নেই। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতনও আজ আর মুক্ত নেই, যে, এরা সেখানে প্রাণ ফিরে পাবে। শান্তিনিকেতন আজ প্রধানমন্ত্রীর সার্টিফিকেট ধন্য, রাজনীতিপালিত। সেখানে শৈশব নেই, আনন্দ নেই। শ্রীনিকেতনে বীরভূমের লোককারিগর নেই। যেখানে হয়ত এসব বাচ্চারা প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে বেঁচে যেতে পারত। অন্তত প্রতিবন্ধী নামক আর এক নতুন হরিজন শ্রেণীর ভাষা পরিচয়ের লজ্জা বহন করতে হত না। বাগবাজার, বস্তিতে এগারো বছরের গোভা সুবল আমার আঁচল টেনে কী যে বলত, তার মর্ম আজও আমি খুঁজে পাইনি। যদিও তীব্রভাবে তার অকথিত মুখ আমার মনে পড়ে।

অনেক ঘরের উঠোনওয়ালা এক বাড়ি। অন্ধকার। মহাত্মা গান্ধী রোডের বাঁদিকে, কলেজ স্ট্রিট ক্রসিং পেরিয়ে খুব পুরনো বাড়ি। ঠাণ্ডা। দোতলায় অনেক ঘর পেরিয়ে অমিত ও তার মাকে ফিরে পাওয়া গেল। ঘরে ঢুকেই এক অনাস্বাদিত শিহরণ বয়ে গেল আমার শরীরে। খাটের ওপরে নক্সা করা কাঁথায় শুয়ে আছে তুলতুলে গালফোলা ছোট্ট একটা বাচ্চা। অমিত ঝুঁকে পড়ে তার

অসম্ভব ছোট্ট একটা পায়ে হাত দিয়ে বসে আছে। চোখ বোজা, মুখে স্বপ্নে পাওয়া হাসি। আমি অনেকটা সময় কথা বলতে পারিনি। ওর মা নীরবতা ভেঙে কথা বলে, 'অমিত ওর ছোট্ট বোনকে নিয়েই থাকে এখন।'

'সব সময় ?'

'না, হঠাৎ করে উঠে গিয়ে পাশের ঘরে তবলা বাজায়।'

'অন্য বাচ্চাদের কি ভালোবাসে ?'

'সেটাও ওর খেয়াল। তবে বাচ্চারা ওকে খুব ভালবাসতে চায়।'

'অমিত আমাদের কথার ফাঁকে গাইতে থাকে,

'নীল আকাশে কে ভাসাল…'। অমিতের গলায় সেই ছোট্ট ঘুঙুর, আর পাশের টেবিলল্যাম্পের আলো-ছায়ায় ছোট্ট বাচ্চাটার লাল পা দুটোর দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে ফেলি,

'অমিতকে একদিন বেড়াতে নিয়ে যাব।' ওর মা চমকে তাকায়। ভীষণ অবাক হয়ে গেছে মনে হয়। আমি সামলে নিই।

'না, মানে ওর বাইরে যাওয়া দরকার। এমন করে গান শিখল কোথা থেকে ?'

'অনেক জায়গায় বেড়াতে গেছে। কিছুই ভোলে না। বাসে গেলেও, মুখ বাড়িয়ে আকাশ দেখতে দেখতে যায়। গান, ও নিজেই শেখে। যে সুর ওর ভাল লাগে, সে শুনেই শিখে নেয়', বলে অমিতের মা থেমে যায়।

'অমিতের বাবা' বলে পরিচয় করায়। সাদামাটা ভদ্রলোক ঢুকলেন,

'আপনি কি কোন কাগজ থেকে এসেছেন ?'

'না, না, আমি ছোট্ট একটা কাজ করছি।' অমিতের বাবা একটু দমে গেলেন মনে হয়। হায় ! অমিতরা খবরের কাগজের পাবলিসিটি মাধ্যম হোক, তার বাবারাই চায়। ভদ্রলোক অমিতের জন্মের আগের ও পরের ডাক্তার, ওষুধের একটা লম্বা ইতিহাস দিলেন। এমন কি গর্ভাবস্থায় অমিতের মায়ের গর্ভে জল জমে গিয়েছিল, তার খবর দিতে আমি চেয়ে দেখি অমিতের মায়ের মুখ শুকিয়ে গেছে, মাথা নীচু করে রয়েছেন। আমি প্রায় তাড়া খাওয়া স্বরে বলে উঠি, 'না, না, এসবের আর প্রয়োজন নেই। সামনে কী করবেন বলুন।' ভদ্রলোক প্রায় হারার মুখে বলে ওঠেন,

'যা হবার তা হবে', এরকম প্রশ্ন করে লাভ কী ?' সত্যিই তো প্রশ্ন করে লাভ কী ? সত্যিই অমিতের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল ? সবটাই প্রশ্ন, সবটাই তিমিরে। উঠে আসছি, দেখি বাচ্চাটাকে পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে অমিত হাসাবার

চেষ্টা করছে আর আপননে গুনগুন করে কথা বলে যাচ্ছে। অজস্রধারায় লালা ঝরে পড়ছে। কসবার অনিন্দিতা হয়ত ভবিষ্যতে কী ভাবে বাঁচতে হবে, তার একটা সূত্র খুঁজতে আসতে পারে অমিতের কাছে, যদি অনিন্দিতাকে অমিতের কাছে পৌছতে দেওয়া হয়!

প্রবল বর্ষায় ডোবা গ্রাম নয়ায় রাতে পৌছই। দুখুশ্যাম চিত্রকরের গ্রাম। দুখুশ্যামের আঁকা পট, যা দেখে প্রায় সমগ্র প্রকৃতিনাট উঠে আসে চোখের সামনে। দুখুশ্যাম শুধু চিত্রকর নয়, দুখুশ্যাম একজন মানুষ, একথা আমরা কখনও ভাবি না। যা আঁকতে চায় না, শহরে এসে তাই তাকে আঁকতে হয়েছে। বাঁচার জন্য পুরাণপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তাকে আনবিক যুদ্ধের ওপর আঁকতে হয়েছে। বধূহত্যা ও পণপ্রথা নিয়ে পট আঁকতে হয়েছে। অর্থাৎ শহরের হঠাৎ উঠতি আধুনিক বিত্তবানদের, উঠতি নারী-আন্দোলনকারীদের অর্ডার অনুযায়ী তাকে এঁকে দিতে হয়েছে। জোতি, পুলিন, যমুনা, সব চিত্রকরদেরই আজ বাঁচার জন্য পট ছেড়ে চাষের শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে হচ্ছে। গ্রামের, দেশের রাজনৈতিক চরিত্রকে বুঝতে হচ্ছে। গ্রাম থেকে যেসব মানুষ শহরে চলে আসছে পুকুর, গাছ, নদী, ভিটেমাটি ছেড়ে তাদের যন্ত্রণা দুখুশ্যামের পটের গানে জ্যান্ত, 'যেমন, ছেলের কাছে মায়ের যন্ত্রণা'। দুখুশ্যামের কাছে তার জন্মভূমি এই,

'বৃক্ষ, পুকুর, জায়গা, জমি
এই নিয়ে জন্মভূমি'।

দুখুশ্যাম বোধহয় তার আত্মঅবমাননা ভুলতে ছেলেকে চেয়েছে পটের পৃথিবীতে। তার ছেলে মন্টু, যার বয়েস বারো, সে এখন পট আঁকে। ছেলেকে দুখুশ্যাম শহরে আনে না। রঙ, তুলি, কাগজ যোগায়। মন্টুর আঁকা সাঁওতাল পটে সাঁওতাল জন্মের আদিকাহিনী—আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি, এতটুকু ছেলে কী করে এঁকেছে এই জগতের ছবি, ঘন জটিল রহস্যময় প্রাণগুলি। মন্টুর পটে গোদার ছিপ নিয়ে মাছ ধরার ছবি যেন আড়ালে এই শহরকেই ব্যঙ্গ করেছে। গোদার মুখ, যা এই শহরের অসহায়তা, চালাকিকে প্রকাশ করেছে। সেই বর্ষার রাতে ভিজে কাঁথা থেকে উঠে, বাচ্চাদের জাগিয়ে মন্টুর মা কুপি জেলে আমাদের জন্য ভিজে কাঠে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ভাত, ডাল, আলুসেদ্ধ রেঁধেছিল। মাঠের কলাপাতা কেটে এনে খেতে দিয়েছিল। ঘরের ভিতর থেকে মাথা বাড়িয়ে,

'আপনাদের খাওয়া হলনি?'

আমার জন্ম গ্রামে। আমাকেও কি মণ্টুর মা শহরের বলে ঠাওরাল। হয়ত তার পক্ষে স্বাভাবিক। বর্ষায় ডোবা গ্রামে এসে, বেশিরাতে শিশুদের ঘুম কেড়ে নিয়ে, শেষ কেরোসিনটুকু পুড়িয়ে যদি শিল্পী দুখুশ্যামের বউকে শহরের মানুষের আপ্যায়ন, ভোজন করাতে হয়, তাহলে আমি ও আমরা অতিথি। আমার অপরিচয়, আমার প্রতিবন্ধকতা ঘুচাবে কে? মনে মনে প্রশ্ন করি। দুখুশ্যামের কাছে গ্রাম ছাড়া মানে জন্মভূমি ছাড়া, এ দুঃখ আমারও। তবু, যারা শহরে থেকে গেছে তারাও একদিন গ্রাম ছেড়েছে। দুখুশ্যাম, পুলিন-জ্যোতি-মণ্টুর মধ্যে সেই আকাশ, সেই মাটির স্পন্দন রেখে যেতে চায়, যা কেনা বেচা করা যায় না। সব কিছু হারিয়েও।

খোলা জিপ পৌছয় মেদিনীপুর স্টেশনে। দুখুশ্যাম আমাদের সঙ্গী। স্টেশন থেকে একটু দূরে একটা মাঠে একদল ইরানীর তাঁবু। খবর আগেই পেয়েছিলাম। বেদের তাঁবু, ঠিকে মজুরদের তাঁবু দেখেছি। খোলা মাঠে চারদিকে খড় বিছানো, দড়ি দিয়ে তাঁবুগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে, খুঁটিতে বাঁধা। একটা লাল রেশমী সুতোগোছায় জড়ানো বেণীর প্রান্ত তাঁবুর বাইরে দেখা গেল।

আমাদের জুতোর শব্দে ঝটিতি বেণী নড়েচড়ে উঠল এবং বেরিয়ে এল এক কিশোরী। বইতে পড়া ইরানী কিশোরী নয়। একেবারে জলজ্যান্ত। সুর্মায় আঁকা চোখ বাঁকা বিদ্যুৎ রেখার মতো। তীক্ষ্ণ নাক। ঘাঘরা। জরিজড়ানো তামাটে ঘন চুলের লম্বা বেণী দুলছে। আবার তাঁবুর ভেতর অদৃশ্য হল। একটু দূর থেকে ঘন তামাটে পোড়া গায়ের রঙ, কাটা কাটা অথচ ভরাট লাবণ্যময় চেহারার এক বৃদ্ধ এগিয়ে আসছেন। চোখের দৃষ্টি তীব্র উজ্জ্বল অথচ শান্ত। আমাদের পথপ্রদর্শক দীপকদা বলে ওঠেন,

'আপনাদের খোঁজে এলাম।' আবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে, একটা ধার থেকে গিয়ে শান্ত হল,

'আমাদের খোঁজ? আমরা দশ বছর এই স্টেশন চত্বরেই আছি।' বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায়। আমাদের কেউ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি না। 'খোঁজ' শব্দে যেন ইরানী মানুষটির তীব্র ক্ষোভ আর যন্ত্রণা ঝরে পড়ল। এমনভাবে প্রশ্নের মুখোমুখি হব, ভাবতে পারিনি।

সঈদা বেগমের মায়ের গলা এমনই শুনেছি। আমাদের পথপ্রদর্শক বলে ওঠেন,

'না জানতে চাই, দেশে ফিরতে চান কি না।'

প্রায় রূপকথার মতো যুবা, কিশোর, যুবতীরা এসে জমে গেছে। ইরানী বৃদ্ধ হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ অথচ প্রায় শান্ত আজ্ঞাস্বরে বললেন,

'তুম তো ক্লান্ত। বায়ঠ্ যাও বেটি।' কথার মধ্যে কী যে ছিল আমি বলতে পারব না। হঠাৎ যেন সব ক্লান্তি অনেকখানি দূরত্ব দূর হয়ে গেল। বেটি বলার মধ্যে এমন মাধুর্য, এমন আদেশ ছিল—আমি তৎক্ষণাৎই মাটিতে বসে পড়লাম। ততক্ষণ আশপাশ কথায়, হাসির একটা উষ্ণ লাবণ্যে ভরে উঠেছে। আমাদের দীপকদা তাঁর মানুষকে আপন করার একটা অকপট অথচ রহস্যময় ছন্দে কথা বলতে শুরু করেছেন, 'আমিও একবার ইরান গিয়েছি। আমার বন্ধুরাও আছে, ইরানী বৃদ্ধের মুখ আরও জ্যান্ত, বেদনার্ত, 'আর পারি না, দেশে ফিরতে চাই, আমাদের দেশে'

'কেন, এখানে কি ভাল লাগছে না?'

'না', তা নয়, চল্লিশ বছর এই দেশে ঘুরছি। এই দেশের মানুষ ভাল। বাংলার মানুষ অতিথিকে ভালবাসে—তবু……'

চেয়ে দেখি, তামাটে কালো চোখের মণি ঝটপট করে ঝাপট দিয়ে একটু টলে গেল। উপচে উঠতে চেয়েও শান্ত হল।

'তবু কী? ইরানে তো রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ…'

কথাটার সুতো ছেড়ে দেন দীপকদা।

'—তবু দেশেই ফিরতে চাই। আমার এই সত্তর বছর বয়স। তিরিশ বছর বয়সে দেশ ছেড়েছিলাম। ডাঙ্গা হোক, খুন হোক, তবু ইরান আমার জন্মভূমি…'

আবার চোখ ঝটপটায়। তামাটে মুখ একটা অসম্ভব যন্ত্রণায় একবার কুঁকড়ে গেল। রাজা এবং দেশান্তরী দরবেশ যেমন হয়। পথে পথে ঘুরেও তার পিপাসার জল সেই সুদূর স্বদেশের মাটিতে।

'কী করে ফিরবেন, ভেবেছেন?'

'এদেশের প্রশাসনের তো মর্জি। কতবার দিল্লীতে আবেদন করেছি। 'হবে, যাওয়ার ব্যবস্থা হবে' বলেও শেষ অব্দি যাওয়ার ব্যবস্থা হয়নি। আপনি তো বহু জানেন, আপনি আমাদের জন্য একটু দেখুন না।' 'আমিও প্রায় ঠিকানাহীন। আমার কথা প্রশাসন শুনবে কি?' দীপকদার কথায় বৃদ্ধ একবার মুখ তুলে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যান।

'—সবাই আজ দেশ ছাড়া, ঘর ছাড়া। যাদের দেখছেন, তাদের সবাই দেশে ফিরতে চায়। আমি তো সবচেয়ে প্রাচীন, প্রায় এদের সবার, ওই আপনাদের ভাষায় 'ঠাকুর্দা'

—বলে বৃদ্ধ সবার দিকে ঘন স্নিগ্ধতায়, ভালবাসায় দৃষ্টি বুলিয়ে যান। একটু স্মিত হাসি ততক্ষণে দেখা দিয়েছে। অনেক সমাধানহীন প্রশ্ন নিয়ে আমাদের

ফিরতে হয়েছিল। এই দেশান্তরী দল তাঁবু ফেলেও ঘর বাঁধতে পারেনি মানুষের মধ্যে থেকে অপরিচিত ছিন্নমূলের দলে—প্রান্তবেদনার বিচ্ছিন্নতা ও সাযুজ্য সেখানেই। জানি না, এই তাঁবুর যুবা, কিশোরীরা এই পশ্চিমবাংলা, স্টেশনদেশ ছেড়ে চলে যেতে চায় কিনা। কোন কিন্তু, কোন মায়ার টান কি নেই? দুখুশ্যামের পটের গান, দেশান্তরী হওয়ার অসহায়তা ও ভালবাসার যন্ত্রণা, 'যেমন ছেলের কাছে মায়ের যন্ত্রণা' বার বার ফিরে আসছে। দেখি আমাদের সঙ্গী দুখুশ্যাম চিত্রকরেরও মুখ বিষণ্ণ হয়েছে। ঘৃতাচী অপ্সরার বংশধর পটশিল্পীরা যুগে যুগে যাযাবর, জাতহীন, ধর্মহীন। হিন্দুও বটে, আবার মুসলমানও। কিন্তু কোথাও ঠাঁই পায় না, শুধু পটের পৃথিবীতে বেঁচে থাকা ছাড়া। বেহুলা এই মৃত সভ্যতাকে নিয়ে দেশান্তরে ভেসে ভেসে চলেছে—কবে প্রাণ পাবে, আবার নতুন প্রাণ, নতুন ছন্দস্পন্দন বেজে উঠবে—এই আশায়। মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের অঙ্কিত পোদ্দারের আঁকা ছবি বিকাশ কেন্দ্রের কাচের ঘরে। মানসিক প্রতিবন্ধী অঙ্কিতের মৃত্যু হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ কি ফুরিয়েছে? মানসিক প্রতিবন্ধীরা শুধু প্রতিবন্ধী বলেই কী বিকাশ কেন্দ্রে লালিত হবে? অঙ্কিতের ছবিগুলি কি বিকাশ কেন্দ্রের দেওয়ালের আড়ালেই থেকে যাবে?

আলি হোসেন। পূর্বাশা বস্তির আলি হোসেনকেও বাঁচানো যায়নি। সেই দশ-বারো বছরের ছেলেটি যে একটা খাতা পেনসিল নিয়ে রোজ নীরবে আমার পাশে এসে বসত, আর গল্প শুনত আর উঠে আসার সময় পিছু পিছু অন্ধকারের খুব ফিস্ ফিস্ করে বলত, 'আমারে একটু পড়া দেখান না, আমারে একটা গল্পে বই···।' রাস্তা পেরোতে গিয়ে গাড়ীর ধাক্কা খায়, বিশদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ালড়ি করে। বাঁচেনি। মাথার ভেতরে রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যায়। তখন তার বেডের পাশে রাত-দিন ঘুমহীন তার নমাসের গর্ভবতী মা। আলি মারা যাওয়ার পর কেমন শান্ত পাথর হয়ে গিয়েছিল। নতুন বাচ্চার জন্ম হলে বলত, 'আবার আমার আলি ফিরে এসেছে।' কিন্তু এখনও আলি হোসেনের সেই গাঢ় ফিস্‌ফিস্ অনুরোধ মাঝে মাঝে আমায় ওলট-পালট করে দেয়। মৃত্যুরও চূড়ান্ত প্রান্তদেশ আছে—যেখানে আলি হোসেনকে যুঝতে হয়েছিল—সেখানে আমার মনের সঙ্গেও আমি যুঝে যাচ্ছি।

পথে ঘাটে, ফুটপাতে, জঙ্গলের ভিতর মানুষের মৃত্যু বেড়েছে। কেউ গ্রাম থেকে শহরে বাঁচতে এসে মরেছে। লীলার ভিতর যেতে গিয়ে পথ হারিয়ে আর ফেরেনি। কোন রাতে কোন শহিদের, কোন মহাপুরুষের মাথা অন্ধকারে ভাঙা হয়ে অন্ধকার জগতে চলে গেলে—তার প্রান্তিক দর্শক পথমানুষেরা।

দিনের যে জীবনস্রোত ও লীলারহস্য—অন্ধত্ব ও দৃষ্টির যে ধারা বয়ে চলেছে, তার দ্রষ্টা প্রান্ত মানুষেরা। তাদের মাথা শহিদের নয়, তাদের মাথা মহাপুরুষেরও নয়। তাদের স্মৃতিজগৎ আছে, চোখ আছে। 'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ' —তাদের পাশাপাশি তাদের থেকে দূরে—চেনা দেশে অচেনা মানুষেরা।

সেদিন মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে খুব পুরনো বাড়ির সিঁড়িতে যে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলাম, তা আমাকে মাঝে মাঝে জর্জরিত করে তোলে।

'কার ইন্টারভিউ? অঙ্কিতের? সে দেড়বছর আগে মারা গেছে। জানেন না?'—প্রশ্ন অঙ্কিতের মায়ের। □

Space donated by :

Grewal Transport Co.

Space donated by :

Planters Airways Ltd.
Road and Air service all over India

Adm. Office :
10, Polock Street, Calcutta-700 001
Phone : 26-9028, 27-6895/6

Booking Office :
38, Kali Krishna Tagore Street,
Calcutta-70
Phone : 39-0784/5

Delivery Office :
67/28, Strand Road, Calcutta-700 006
Phone : 38-1161, 38-4681